বিতর্কের কেন্দ্রে নতুন শিক্ষাক্রম

আশরাফুল আযম খান
০৪ ডিসেম্বর ২০২৩, ১২:০০ এএম

নতুন শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীরা শিখছে; শিখছে ভিন্নভাবে। আগের শ্রেণিকক্ষের চার দেয়ালটিই ছিল তাদের শিক্ষা আহরণের একমাত্র ক্ষেত্র। এখন পুরো পৃথিবীটাই তাদের শেখার জায়গা। নতুন শিক্ষাক্রমে তারা শিখছে শ্রেণিকক্ষে, শিক্ষকদের কাছ থেকে; শিখছে পরিবারে অভিভাবকদের কাজ দেখে; শিখছে পাশের বিভিন্ন পেশাজীবীর জীবন অভিজ্ঞতা থেকে, তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে।

শিক্ষা এখন কেবল স্মৃতি বা মুখস্থনির্ভর নয়; হাতে-কলমেলব্ধ অভিজ্ঞতাই এখন শিক্ষা। তারা এখন কেবল এককভাবে শিখছে না; শিখছে জোড়ায় সহপাঠীর সঙ্গে একান্ত হয়ে, জোড়ায় জোড়ায়, দলগতভাবে। নিজে বলছে, অন্যের কথা শুনছে। দলীয় কাজে অন্যের মতামতকে গুরুত্ব দিতে, অন্যের মত মেনে নিতে শিখছে। শিখন এখন শিক্ষককেন্দ্রিক নয়, শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক। শিখন কাজে ছাত্রছাত্রীরা আর পেসিভ সত্তা নয়। তারা সক্রিয় ও জীবন্ত সত্তা। তাই শিক্ষার নবপদ্ধতিগুলো এখন তাদের কাছে সমান আনন্দদায়ক আর অংশগ্রহণমূলক।

শিক্ষার্থীরা এখন বাসায়, শ্রেণিকক্ষে বানাচ্ছে এআই প্রযুক্তিনির্ভর কম্পিউটারের সিমুলেশন, রোবট, বৈদ্যুতিক সার্কিট, গ্রিন হাউস, প্রাণীকুলের বাস্তুভিটা, আগামী দিনের বিকল্প জ্বালানির মডেল, জ্যামিতির নানা আকৃতি, নিজের ব্যবহৃত স্কেলসহ নানা বিষয়। শিখছে নিজের শ্রেণিকক্ষের পরিমাপ, নিজের প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোর জ্যামিতিক ও গাণিতিক প্রকাশ। কী করে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়, কী করে অপরিচিতজনের সঙ্গে মিশতে হয়Ñ তাও শিখছে। শিখছে নিজেকে শিক্ষক, সমাজকর্মী, সাংবাদিক, ডাক্তার, ইমাম, কৃষক, দোকানদার, রাঁধুনি ইত্যাদি চরিত্রের নাম ভূমিকায়। তাদের শেখানো হচ্ছে সৃজনশীলতা আর স্বনির্ভরতা। তাদের শেখানো হচ্ছে নিজের কাজ নিজেই কীভাবে করতে হয়, এর গুরুত্ব ও নানা কলাকৌশল। তারা শিখছে ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজ, বিজ্ঞান, গণিত, ধর্ম-নৈতিকতা, শারীরিক শিক্ষা, ক্যারিয়ার ইত্যাদি বিষয়। কেবল রান্নাবান্না শিখছে না বা রাত জেগে কাগজ কেটে প্রজেক্ট তৈরি করছে না।

তথ্যপ্রযুক্তি, এআই, ন্যানো টেকনোলজি, বায়োটেকনোলজির প্রভাবে দুনিয়া যে দ্রুতগতিতে পাল্টাচ্ছে, এতে শিক্ষার্থীদের কয়েকটি বিষয় শেখালেই যথেষ্ট নয়; কীভাবে বিষয়টি শিখতে হবে, সেটি শেখানোই সবচেয়ে জরুরি। শিখনবস্তুর চেয়ে শিখন-শেখানোর কৌশলটিই এ সময় এবং আগত সময়ের জন্য জরুরি। এ প্রক্রিয়ায় তারা অজানা ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে ও পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারবে। বর্তমান শিক্ষাক্রম এদিকটিকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করছে। পৃথিবী যে গতিতে বদলাচ্ছে, এ সময়ে দাঁড়িয়ে আপনি বলতে পারবেন না আপনার যে ছেলে বা মেয়ে এখন প্রথম শ্রেণিতে পড়ছেÑ পঁচিশ বছর পর সে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, ব্যাংকার হবে। কেননা ধারণা করা হচ্ছে, আজ থেকে পঁচিশ বছর পর এখনকার অনেক পেশাই আর থাকবে না; এমনকি কোনো পেশাই বেশিদিন স্থায়ী হবে না। এ বাস্তবতায় এখন থেকেই শিক্ষার্থীদের কেবল কোনো একক বিষয় শেখানোর চেয়ে শেখার কলাকৌশল শেখানোটিই মুখ্য। শেখার মানসিকতা তৈরি করে লার্নিং-আনলার্নি-রিলার্নিং প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিচিত করানো গেলে তারা যে কোনো শিখনবস্তু আয়ত্ত করতে পারবে।

এই শিক্ষাক্রমের মূল লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতাগুলোকে তৈরি করা। তাই অসংখ্য যোগ্যতা থেকে বিষয়ভিত্তিক কিছু যোগ্যতা চিহ্নিত ও সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। তা শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক শ্রেণি থেকে থেকে অর্জন করতে পরবর্তী ধাপে উঠতে হবে। যতই বড় শ্রেণিতে উঠবে, ততই তাদের নির্দিষ্ট যোগ্যতাগুলোর উচ্চতর রূপ অর্জন করতে হবে। এই যোগ্যতাগুলো অর্জিত হচ্ছে কিনা, তা বছরের মাঝে বা বছর শেষে যাচাই না করে প্রতিটি সেশনে (এখন আর ক্লাস বলা যাবে না) মূল্যায়ন করা হচ্ছে। এই মূল্যায়ন যেমন করছেন শিক্ষক, তেমনি শিক্ষার্থীরা একে অন্যকে; এমনকি তার অভিভাবক বা কমিউনিটির লোকজন তাকে মূল্যায়ন করছে।

দক্ষতার পারদর্শিতা অর্জিত না হলে মূল্যায়নের পর আবারও ব্যবস্থা নিতে হবেÑ যেন অপূরণীয় দক্ষতাগুলো শিক্ষার্থীরা অর্জন করতে পারে। তাই এই পদ্ধতিতে আগের মতো বার্ষিক বা ষাণ¥াসিক পরীক্ষার গুরুত্ব থাকছে না। এর মানে এই নয় যে, শিক্ষার্থীদের আর পরীক্ষা থাকছে না। পরীক্ষা থাকছে না বলে যারা ভাবছেন বা প্রচার চালাচ্ছেন তাদের জন্য তথ্য যে, এ পদ্ধতিতে ষাণ¥াসিক বা বছর শেষে পরীক্ষা তো থাকছেই; বরং এর পাশাপাশি প্রতিদিনই মূল্যায়ন করা হচ্ছে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি, অর্জন-অনর্জনকে। তবে এটিকে পরীক্ষা না বলে মূল্যায়ন বলা হচ্ছে। এ লক্ষ্যেই পাঠ্যপুস্তক নতুনভাবে ঢেলে সাজানো হয়েছে।

আধুনিক শিক্ষার এপ্রোচে বছর শেষে পরীক্ষার চেয়ে এ ধারাবাহিক মূল্যায়নকে জগৎজোড়া গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই মূল্যায়ন পদ্ধতিতে গ্রেড বা নম্বরপ্রাপ্তির চেয়ে শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিক্ষত যোগ্যতা কিংবা দক্ষতা অর্জনের দিকটিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা

হয়। এ কারণেই আশা করা যেতে পারে, নবপ্রবর্তিত শিক্ষাক্রমের বাস্তবায়ন সফল ও সুচারুভাবে করা গেলে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার উপজাত রোগ যেমন কোচিং বা প্রাইভেট টিউশনিনির্ভরতা, গাইড বইনির্ভরশীলতা, এ প্লাসপ্রাপ্তির অসুস্থ প্রতিযোগিতা কমে আসবে।

নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের মূল নায়ক শিক্ষক। শিক্ষকদের যথাযথ প্রেষণা, প্রশিক্ষণ, প্রণোদনা দিলে এর সাফল্য প্রত্যাশা করা যায়। কেবল উপর থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করে বা নামকাওয়াস্তে প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্তব্য শেষ করলে এটি যে ব্যর্থ হবে, তা সহজে অনুমেয়। এ ব্যবস্থা চালু হলে কোচিং বা টিউশনিনির্ভর শিক্ষকদের আয়ে টান পড়বে বলে অনেকে এর বাস্তবায়ন নাও চাইতে পারেন। এ ক্ষেত্রেও সব পর্যায়ের শিক্ষকের জীবনের আর্থিক নিশ্চয়তা নিশ্চিত করা ছাড়া এর সুফল মিলবে না।

পৃথিবীর ১৩৭ দেশে শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধার তালিকায় বাংলাদেশের শিক্ষকদের সুবিধার অবস্থান ১৩৪তম। তা এটির বাস্তবায়নের প্রতিকূল। গার্মেন্টকর্মীদের ন্যূনতম মজুরির চেয়েও কম বেতনে দেশের অনেক শিক্ষককে জীবন নির্বাহ করতে হয়। তাই তো হরহামেশাই শিক্ষকদের অনলাইনে মধু বেচে, খেজুর বেচে জীবন চালাতে হয়। শিক্ষকদের পাশাপাশি অভিভাবকদের এই শিক্ষাক্রমের সুফল ও করণীয় জ্ঞাত করার প্রয়োজন আছে। ইতোমধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অপপ্রচার, ভুল তথ্য এর সুফল সম্পর্কে অভিভাবকদের সন্দিগ্ধ করে তুলেছে।

গত আড়াই দশকের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা, শিক্ষাবিজ্ঞান অধ্যয়ন সূত্রে আমি নবপ্রবর্তিত শিক্ষাক্রমের এই মর্ম অনুধাবন করছি। যারা এর বিরোধিতা করছেন, তারা খণ্ডিত জেনে বা না জেনেই বিরোধিতা করছেন অথবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে। আমাদের স্বাভাবিক প্রবণতা এই যে, আমরা না জানলেও জানার ভান করি; কাজের চেয়ে কথা বলি বেশি।

আশরাফুল আযম খান : অধ্যক্ষ, লিবার্টি স্কুল অ্যান্ড কলেজ